# স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতামালার বৈশিষ্ট্য

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা এবং ইংরেজি রচনাবলিতে তাঁর শিকাগো বক্তৃতামালার বেশ কয়েকটি বক্তৃতার পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ রয়েছে। ছটি বক্তৃতা এখানে আমরা পাই : ১৮৯৩-এর ১১ সেপ্টেম্বর 'অভ্যর্থনার উত্তর', ১৫ সেপ্টেম্বর বিখ্যাত কুয়োর ব্যাঙ ও সাগরের ব্যাঙের গল্প, ১৯ সেপ্টেম্বর নবম অধিবেশনে পঠিত 'হিন্দুধর্ম' নামক প্রবন্ধটি, ২০ সেপ্টেম্বর দশম দিনের অধিবেশনে 'ভারতের সর্বাধিক প্রয়োজন কী?' বা 'খ্রিস্টানরা কী করতে পারে?' এবং তার সঙ্গে সনাতনধর্মের পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা, ২৬ সেপ্টেম্বর ষোলোতম দিনের অধিবেশনে বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুদের সম্বন্ধ নিয়ে একটি ভাষণ, ২৭ সেপ্টেম্বর সতেরোতম দিনে বিদায়ী সম্ভাষণ। এছাড়া ২২ সেপ্টেম্বরও তিনি একটি ভাষণ দিয়েছিলেন মুখ্যত হিন্দুধর্ম ও বেদান্তদর্শন নিয়ে। বিজ্ঞানবিভাগেও কয়েকটি ভাষণ দেন তিনি। তার মধ্যে ২২ সেপ্টেম্বরের ভাষণটি 'ভারতের বর্তমান ধর্মসমূহ' বিষয়ে। ২৩ সেপ্টেম্বর তাঁর অন্যান্য বক্তৃতাগুলির একটি সারসংক্ষেপ করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর হিন্দুধর্মের সারাংশ নিয়ে একটি এবং ২৬ সেপ্টেম্বরও একটি বক্তৃতা করেছিলেন। তবে সবগুলি এখনও উদ্ধার করা যায়নি। কিন্তু আমাদের কাছে যা সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগে সেটি এই—তাঁর আলোচনার বিষয়টি অসাধারণ এবং মনে হয় যেন বিবেকানন্দ অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে, সচেতনভাবে এই বক্তৃতাগুলি উপস্থাপন করেছিলেন পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে। শুধু তাই নয়, তাঁর নিশ্চয় এই সচেতনতাও ছিল যে এই বক্তৃতার ভাব গোলার্ধ ছাড়িয়ে পৌঁছে যাবে তাঁর দেশেও—পৌঁছে যাবে দেশান্তরে, কালান্তরে। তাই আজ একশো পঁচিশ বছর পর যখন বিবেকানন্দের দেওয়া এই বক্তৃতাগুলির কথা আমরা ভাবতে বসি তখন শুধু বিস্ময় জাগে তা-ই নয়, মনে হয় সমস্ত বিশ্ব যেন এই যুগাচার্যের চরণতলে বসে শিক্ষার্থীর মতো গ্রহণ করতে পারে তাঁর বাণীর সারাৎসারকে। যদি তাঁর বক্তব্য বিষয়গুলিকে আমরা কয়েকটি মূল ভাগে ভাগ করে নিই, তাহলে তা এরকম দাঁড়ায়—

প্রথমত সনাতন হিন্দুধর্মের একটি শাশ্বত,

স্থায়ী, দেশ-কাল-ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য, যুক্তিনির্ভর চরিত্ররূপ তিনি তৈরি করে দিয়ে গেলেন। অনেকেই বলেছিলেন হিন্দুধর্ম নিয়ে—সেইসময়, তাঁর আগে, তাঁর পরে। কিন্তু এত অসামান্য যুক্তিগ্রাহ্য রূপ আর কেউ তৈরি করতে পারেননি। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, যখন তিনি বক্তৃতা শেষ করলেন তখন যেন হিন্দুধর্ম নতুনরূপে জন্ম নিল। আমাদের মনে হয়, নতুনরূপে জন্ম নেওয়া শুধু নয়, যেন হিন্দুধর্মের চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে চিরকালের জন্য একটি স্থির সুচিন্তিত তথা ধ্রুব কাঠামোয় গেঁথে দিয়ে যাওয়া। বিবেকানন্দ ছাড়া আর কেউ এটি করতে পারতেন না। সেদিন তিনিই ছিলেন বিধিনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক দেবতা। এখন আমরা দেখব সনাতন হিন্দুধর্মকে বিবেকানন্দ কোন কোন বৈশিষ্ট্যে স্থাপিত করলেন।

এক, তিনি দেখালেন সনাতন হিন্দুধর্ম কেবল সহিষ্ণুতার কথা বলে না, বরং সত্যরূপে স্বীকার করে সকল ধর্মকে।

দ্বিতীয়ত, তিনি এও দেখালেন, সনাতন হিন্দুধর্ম বলতে চায়, আত্মস্বরূপ উপলব্ধি তথা নিজেকে পূর্ণ করাই মানবজীবনের লক্ষ্য এবং সেটাই মানবজীবনের সংগ্রাম। 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলেছেন, ক্রমাগত সংগ্রাম ও সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা, দিব্যভাবে ভাবান্বিত হয়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যাওয়া ও তাঁর দর্শনলাভ করে তাঁর মতো পূর্ণ হওয়াই হিন্দুর ধর্ম। পূর্ণ হলে মানুষের কী অবস্থা হয়? উত্তর দিচ্ছেন বিবেকানন্দ—মানুষটি অনন্ত আনন্দময় জীবনযাপন করেন। অনন্তের একমাত্র উৎস ঈশ্বরকে লাভ করে তিনি পরমানন্দের অধিকারী হন। বিবেকানন্দ সমগ্র পৃথিবীর সামনে মানবজীবনের লক্ষ্যকে ঘোষণা করে গেলেন, একটি বিশেষ 'চার্টার' তৈরি করে গেলেন অনাগত কালের জন্য। এই কথাটি ইতিহাস কোনওদিন ভুলতে পারবে না।

তৃতীয়ত, বিবেকানন্দ ঘোষণা করলেন—সনাতন হিন্দুধর্ম একত্বের কথা বলে ঠিকই—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি', কিন্তু বহুত্ববাদকে সে অস্বীকার করে না। ধর্মে, জাতিতে, কর্মে, শিক্ষায়, সম্পদে—আকারে-প্রকারে মানুষের সভ্যতার বহুত্বকে সনাতন ভারতীয় ধর্ম কোনওদিন অস্বীকার করেনি। 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতায় বিবেকানন্দ খুব চমৎকার একটি সিদ্ধান্তবাক্য উচ্চারণ করেছেন—বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির অবস্থা। হিন্দুরা এই রহস্য ধরতে পেরেছে। একত্বকে তারা যেমন বুঝতে পেরেছে, তেমনি বুঝতে পেরেছে এই একত্বের দিকে যাত্রার পথ আসলে বহুত্বকে স্বীকার। এই দুইকে স্বীকার, উপলব্ধি এবং এই দুইকে নিজের জীবনে রূপায়ণের মধ্য দিয়েই সনাতন হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সামনে নিজের চরিত্রকে প্রকাশ করতে পেরেছে।

চতুর্থত, বিবেকানন্দ দেখালেন হিন্দুধর্ম তথা সনাতন ভারতীয় ধর্ম মানবসাধনার বিভিন্ন স্তরকে স্বীকার করে—যে-স্তর বাহ্যপূজা থেকে শুরু করে আত্মোপলব্ধি পর্যন্ত, একত্বের অনুভব পর্যন্ত শেষ সীমায় পৌঁছনোর কথা বলে। হিন্দুর দৃষ্টিতে মানুষ ভ্রম থেকে সত্যে যায় না, পরন্তু সত্য থেকে সত্যে—নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে উপনীত হয়। হিন্দুর কাছে নিম্নতম জড়োপাসনা থেকে বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পর্যন্ত সাধনার অর্থ, অসীমকে উপলব্ধি করবার জন্য মানবের বিবিধ প্রচেষ্টা। মানুষ চেষ্টা করে, সাধনা করে সত্যকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু তা তো মুহূর্তে সম্ভব নয়! প্রতি মুহূর্তে নিজের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য মানুষের যে-সাধনা, সে-সাধনাই আসলে বিশ্বের উন্নতির একমাত্র সাধনা। যে-মানুষ সংকুচিত, সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, সে কখনও—

'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া'

—এই উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হতে পারে না।

ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম পৃথিবীকে শিখিয়েছে এই আত্মোপলব্ধির সাধনা—

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদমৃতা ভবন্তি॥"

—প্রত্যেকের মধ্যেই সেই অমৃত রয়েছে। জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠিত—এই উপলব্ধিতেই বিশ্বের মুক্তি।

পঞ্চমত, তিনি দেখালেন সনাতন হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম আসলে পরস্পরের পরিপূরক। অদ্ভুত এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেদিন তিনি ঘোষণা করেছিলেন : বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মকে ছেড়ে বাঁচতে পারে না, হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে ছেড়ে বাঁচতে পারে না। বিবেকানন্দের উপলব্ধি ছিল, সনাতন ভারতীয় বৈদান্তিক ধর্মের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে মেধা। আর বৌদ্ধধর্ম প্রকাশ করেছে অপূর্ব করুণাকে। ভগবান বুদ্ধ আহ্বান করেছিলেন—চরথ ভিক্ষকবে চারিকম্ বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় আর্তায় হিতায় সুখায় দেবমনুষ্যানাম্। সনাতন হিন্দুধর্মের মেধা আর বৌদ্ধধর্মের এই অভূতপূর্ব করুণার শক্তি নিয়ে আগামী পৃথিবী জন্ম নেবে—সমস্ত রকমের অসার ক্রূরতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে—এই ছিল বিবেকানন্দের স্বপ্ন।

হিন্দুধর্মের উপরিউক্ত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বিবেকানন্দ শিকাগো বক্তৃতামালায় প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয়ত এরই সঙ্গে তিনি ঐতিহাসিকের নিরাবেগ তত্ত্বনিষ্ঠ দৃষ্টি নিয়ে প্রকাশ করেছিলেন—ধর্মান্ধতা ও ঘৃণার ফল কী হতে পারে। আমরা জানি অভ্যর্থনার উত্তরে তিনি কী অদ্ভুত দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা কেমন করে পৃথিবীর ইতিহাসকে রক্তসমুদ্রে প্লাবিত করেছে। ক্রুসেডের কথা নিশ্চয় তখন তাঁর মনে হয়েছিল। নিশ্চয় মনে হয়েছিল বিখ্যাত ইউরোপীয় যুদ্ধের কথা, বলকান যুদ্ধের কথা। ইতিহাসের সুচিন্তিত এক পাঠক-গবেষক ছিলেন তিনি। ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়ে এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ সতর্ক করে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন আগামী পৃথিবীকে, ইতিহাসের এই ভুলের পুনরাবৃত্তি আর যেন না হয়।

শিকাগো বক্তৃতামালার তৃতীয় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছিল বিশ্বজনীন ধর্মের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা। সনাতন হিন্দুধর্ম সত্য, নিঃসন্দেহে ঠিক। কিন্তু অন্য কেউ তো বলতে পারে—কেন, আমার খ্রিস্টধর্মও সত্য, আমার ইসলামধর্ম সত্য, আমার বৌদ্ধধর্ম সত্য, জৈনধর্ম সত্য? বিবেকানন্দ তাঁর সেই অসাধারণ শেষ বক্তৃতাটিতে সেই কারণেই একটি অসামান্য সত্য উপস্থাপিত করলেন। বললেন—খ্রিস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না, অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রিস্টান হতে হবে না। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হবে। এটি বিশ্বজনীন ধর্মের মূল ভিত্তি। নিজের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাকে বিসর্জন দিতে হবে না, কিন্তু সেই নিষ্ঠা যেন কোনওভাবে আমাদেরকে অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণায় প্রযুক্ত না করে। সেটি যদি করে তাহলে আমার ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা আছে এমনটি আমি বলতে পারি না, তার কারণ আমার ধর্মের ভগবান যে ওই ধর্মেরও ভগবান। আমার ধর্মের সর্বোচ্চ সত্য যে ওই ধর্মেরও সর্বোচ্চ সত্য। শিকাগো বক্তৃতামালার শেষে বিদায়ী সম্ভাষণে বিবেকানন্দ এইভাবেই বিশ্বজনীন ধর্মের এই অপূর্ব ভিত্তি রচনা করে গিয়েছিলেন। ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মাচরণের নতুন সংজ্ঞা প্রদান করলেন তিনি। মানবজীবন ও ধর্মের নতুন চালচিত্র নির্মাণ করলেন। অজস্র সহস্র বিভেদের মধ্যে মানবসভ্যতার বেঁচে থাকার একটি 'ম্যাগনা কার্টা'—একটি মহাসনদ তিনি দান করে গেলেন

অনাগত মানুষের কাছে। জানি না সেটা গ্রহণ করার জন্য আমরা আজ কতটা প্রস্তুত। আত্মোপলব্ধির সাধনায় আমরা কতটা আত্ম-সংগ্রামী তাও জানি না। আমাদের চারিদিকে কলুষভরা এই ভাঙনের গানের মাঝে, এই রক্ত-অশ্রু-বেদনাভরা দিনযাপনের গ্লানির মাঝে, আজও না-নেভা আলোকদিশা বিবেকানন্দ। একশো পঁচিশ বছর আগে উচ্চারিত তাঁর কম্বুকণ্ঠস্বর আজও আমাদের কানে বাজছে : ''অমৃতের পুত্র, কী মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামেই আমি তোমাদের সম্বোধন করতে চাই।'' না, তিনি আমাদের পাপী বলে ডাকেননি। তিনি আমাদের সাধারণ বলে ডাকেননি, 'অমৃতের পুত্র' বলে ডেকেছেন। যেন সেই সনাতন ঋষি আজও ডাকছেন আমাদের সেই গভীর গম্ভীর মন্ত্রধ্বনিতে—

''শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি।
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।''

দাঁড়িয়ে আছেন বিবেকানন্দ। তাঁর চরণতলে বসে আমরা যেন এই মুহূর্ত থেকে প্রার্থনা শুরু করি—

''চল প্রভু, চল তব বাধাহীন পথে ততদিন—
যতদিন ওই তব মাধ্যন্দিন প্রখর প্রভায়
প্লাবিত না হয় বিশ্ব, পৃথিবীর প্রতি দেশে দেশে
সেই আলো না হয় ফলিত, যতদিন নরনারী
তুলি উচ্চ শির—নাহি দেখে টুটেছে শৃঙ্খলভার—
না জানে শিহরানন্দে তাহাদের জীবন নূতন।''


## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীসারদা মঠের তৃতীয় অধ্যক্ষা পরমপূজনীয়া প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে আগামী ৪ নভেম্বর ২০১৮ মহাজাতি সদনে প্রকাশিত হতে চলেছে একটি স্মারকগ্রন্থ—

**প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা : শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি** সম্পাদিকা : প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা

প্রকাশক : প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি, সি জে ১৪২ সল্ট লেক সিটি, সেক্টর ২ কলকাতা-৯১, দূরভাষ : (০৩৩) ৪০০৮ ০৭৭১, ইমেল : shraddhapranaccc@gmail.com

২৫০ টাকা মূল্যের গ্রন্থটি (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৯২, আর্টপেপারে রঙিন ছবি ২৪ পৃষ্ঠা) প্রকাশের দিন থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত পাওয়া যাবে ২০০ টাকায়।

**প্রাপ্তিস্থান** : শ্রীসারদা মঠ (দক্ষিণেশ্বর), নিবেদিতা স্কুল, সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন কার্যালয়, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক)